এমন যে হীরু ডাকাত, কেমন লোক সে?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

... আমি আপত্তি জানাতে চাই ছেলেমেয়েদের কাছে ভূতপেত্নীর ভয়াবহ গল্প পরিবেশনে। ... ছেলেদের মনোরঞ্জনের আরও তো নানা বিষয় আছে। ভূত-পেত্নীগুলোকে শিশু সাহিত্যের আসরে নাই তাঁরা ছাড়লেন। দুর্দান্ত চোর ডাকাত খুনেদের নৃশংসতার গল্পও ছেলেদের হাতে দেওয়া উচিত বলে মনে করি না। ... শিশু সাহিত্যের কেউ কেউ পিসিমা গোছের অভিভাবিকা আছেন, যাঁরা ছেলেমেয়েদেরও চিবুক ধরে আদর করে বলেন— আহা ষাট! ষাট! তা হোক। তা বলে বাচ্চারা একটু থ্রিল এনজয় করবে না! একেই তো দুধ, ঘি, মাছ, মাংস খেতে পায় না, একটু মুখরোচক সেনসেশনাল স্টোরি পড়ার উত্তেজনা ও আনন্দ থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখব, আরে না না, তা কী হয়?

'সেইসব ভুবনের মাসিপিসিদের কল্যাণে শিশু সাহিত্যে এই ধরনের জঞ্জাল বেড়েই চলেছে। তাঁরা বোঝেন না যে, এগুলো মুখরোচক হলেও ভেজাল জিনিস। ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।'

আজ থেকে বছর সাঁইত্রিশ আগে শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলায় শিশুসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এটা ছিল নরেন্দ্র দেব মহাশয়ের চাপান।

তার উতোর ছিল লীলা মজুমদারের বক্তব্যে:

'... কয়েকটি জিনিসকে শিশুসাহিত্যের বিষয় তালিকা থেকে ছেঁটে ফেলতে হবে, যেমন ছিঁচকাঁদুনে কবিতা। ছিঁচকাঁদুনে গল্প। ... একথা বড়দের সাহিত্যেও যেমন খাটে, ছোটদের বেলাতেও তেমনি। ছিঁচকাঁদুনেদের আমরা কোনও মতেই প্রশ্রয় দেব না।

'কিন্তু চোর ডাকাতের গল্প চলবে। শোনা যায় বিলেতে নাকি ছেলেদের ডিটেক্টিভ বই পড়ে চুরি ডাকাতি করবার ইচ্ছা হয়; সেইজন্য অনেক অভিভাবক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখানে পুনরায় দৃষ্টিভঙ্গির কথা ওঠে। আমাদের ছেলেরা জানে চোররা হল তাদের বাবা-মাদের দুশ্চিন্তার কারণ, অতএব গোড়া থেকে চোরদের প্রতি সহানুভূতি হওয়াটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আর কেন নিশ্চিন্তে বাস করার আনন্দের মধ্যে, একটা মৃদু শিহরণের আনন্দ থেকে তাদের

বঞ্চিত করা? এখনও মনে আছে ছেলেবেলায় নসু ডাকাতের গল্প শুনেছিলাম। সে নৌকো করে চুরি ডাকাতি করত আর তাল তাল সোনাদানা বাড়িতে এনে জমা করত। ... সেই নসু ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগল। এমন ধারা গল্প শুনলে কারও কি কোনও অনিষ্ট হতে পারে?'

যারা শিশুসাহিত্যকে শিশুশিক্ষার সোপান করতে চায়, তাদের উদ্দেশে লীলা মজুমদার বলেছিলেন: ...'ছোট ছেলেদের এইসব শেখাতে হবে'— এই কথা মনে করে শ্রেষ্ঠ রচনা তৈরি হয় না। 'আমি নইলে গাছের পাতায় সবুজ রং ধরবে না'— এই মনে করে কি আর পৃথিবীর ওপর সূর্যের সোনালি রোদ ঝলমল করে ওঠে? কিন্তু তবুও ওই রোদ লেগেই ধরণী শ্যামল হয়ে যায়। সুন্দর হয়ে বিকশিত হওয়াই সাহিত্যের স্বভাব। শেখানো তার আসল উদ্দেশ্য নয়।'

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর 'হীরু ডাকাত' হাতে নিয়ে সেদিনকার সেই পুরনো কাসুন্দির কথা মনে পড়ল।

ভূমিকায় বলা না হলেও, পড়ে মনে হয় ইতিহাসের পাতা থেকে হীরুকে তুলে আনা হয়েছে।

'... উনিশ জনের হাতে জ্বলছে মশাল।
এসব কবে ঘটছে জানো? সেটা উনিশ'শ সাল।'
কিংবা
'... এসব যখন ঘটছে তখন ঠিক উনিশ'শ ন সাল।'

শুধু কাল নয়। আছে দেশেরও হদিস: 'বাড়ি চাঁদের হাট।' '... এই তো এটা কাকদ্বীপ।' 'আমিই ছিলাম রসুলপুরের প্রজা।' 'হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাঁকুড়া আর বর্ধমানের মোড়ে।' 'ঘোড়ামারির ছিদাম দাস।' 'ব্যাটা টাকীর মহাজনের ফেউ।' 'আমরা যাচ্ছি সোনাইদিঘি।' 'এটাই তোমার ছাগলচরা দ।'

'বাংলা বিহার সীমান্তে
দু-কুড়ি লোক প্রত্যহ যায় রাজার জন্য ঘি আনতে।'
'কালকে রাজা শোনপুরের সেই মেলায় যাবে।'
'কারণ তখন বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যায়
সবাই কাঁপে হীরু ডাকাতের নামে।'

এমন যে ডাকাত, কেমন লোক সে? গল্পের পর গল্প গেঁথে হীরু নামের যে মানুষটাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, সে মোটেই রক্তলোলুপ অর্থপিশাচ অমানুষ নয়। তার ফরমান: 'ভীষণ দরকার ছাড়া কেউ/বহাবে না রক্তের ঢেউ।' সব দিকে তার করুণাঘন নজর: 'ঘোড়াকে জল খাইয়েছিস?/এখুনি দে জল...'। 'আহা কী সুন্দর ফুটেছে দোপাটি।'

ভারি নরম মন হীরু ডাকাতের। হতদরিদ্র রাখাল ছেলেদের সে বলে:

'না খেয়ে খেয়ে হাড়জিরজিরে চেহারা—
এক চুমুকে দুধটুকু খা। এই নে কাশীর পেয়ারা!'

হীরু যেমন তেমন ডাকাত নয়। বড়লোকের ধন লুট করে 'গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে

দেয়।' তার স্বগ্রামবাসীরা বলে:

'আমাদের এই গ্রামের নামটি চাঁদের হাট।
চাঁদের হাটের হীরু ডাকাত ভয়ঙ্কর,
দিনের বেলা বাঁশি বাজান, বয়েস ষাট,
রাতের বেলা মন্দ লোকের আতঙ্ক। ...
ভোরের বেলা ফেরেন যখন জবা বনে
লুটের অন্ন রেখে আসেন দুঃখী লোকের হিম উঠোনে।' ...
'হীরু কী খান?
ভিক্ষা যা পান।'

অন্যায় দেখলেই হীরু অত্যাচারিত মানুষের পাশে গিয়ে সদলবলে দাঁড়ায়। যৌতুকলোভী বরপক্ষকে টিট করে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে বাঁচায়। বাংলা-বিহার সীমান্তের নিপীড়িত গোয়ালাদের বাঁচায় রাজবাড়ির লুটেরাদের হাত থেকে। 'অন্ন-বস্ত্র, সোনাদানা, হারানো ঘিয়ের হাঁড়ি/পেয়ে তো সব গয়লাবউরা পরল নতুন শাড়ি/গয়লারা আর ঘুমোয়নি কেউ রাতে/সূর্য ওঠা মাত্র তারা নৃত্য-গীতে মাতে। ' হীরু ডাকাতের কাজ ফতে। এরপর?

হীরু তার দলের লোকদের বলল: 'আট গুনছি, শিগগির যা! বিদায়!'

এমনি করে হীরু তার ডাকাতের দল ভেঙে দিল। হীরুকে ছেড়ে যেতে তাদের প্রাণ চাইছে না। তাদের কাছে হীরু তো ডাকাত নয়, সাক্ষাৎ ভগবান।

পুরোটাই লেখা হয়েছে মন-মাতানো পদ্যে। 'প্রথম অভিযানে'র শুরু এইভাবে: 'আমবাগানের ছায়ায় তিনটে ছেলে/এই ছুটছে, গাছে উঠছে, দিচ্ছে ঠেলে ফেলে/গাছ থেকে তার সঙ্গীকে আর হাসছে হাহা হি হি/হঠাৎ দূরে ঘোড়ার চিঁহি-হি/... টগবগ টগ টগবগ টগ ক্রমেই আসছে কাছে/কী সর্বনাশ! একটা তো নয়, আর কি রক্ষা আছে? ... অনেকগুলো খুরের শব্দ— ভয়েই ওরা কাঠ! ...' পরের দুটো অভিযানের শুরুতেও রয়েছে এই নাটকীয়তা: 'শ্রাবণ মাসের রাত।/ আকাশ ভেঙে নেমেছে আজ ভীষণ জলপ্রপাত।' ... 'বাংলা, বিহার সীমান্তে/দু-কুড়ি লোক প্রত্যহ যায় রাজার জন্য ঘি আনতে ...'

প্রায় কথকতার ছন্দে আর লাগসই মিলে 'হীরু ডাকাত' ভারি মজাদার হয়ে উঠেছে।

অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর মিষ্টি হাতের লেখার সঙ্গে সমান তালে আগাগোড়া পাল্লা দিয়ে গেছে দেবব্রত ঘোষের প্রচ্ছদ আর অলঙ্করণ। প্রায় নির্ভুল নিখুঁত ছাপা। অনেক সময় যত্নে লেখা বই অযত্নে বার হওয়ার দোষে মার খায়। তেমনি উল্টোটাও হয়। যার অর্‌গুণ নেই বর্‌গুণ আছে।

'হীরু ডাকাত' ছোটদের এমন এক বই, যা সবাই দেখলেই হাত বাড়াবে আর কাড়াকাড়ি করে পড়বে।

তাই বলে চাঁদে কি কলঙ্ক নেই?

লেখক হীরুর ব্যাপারে এতই একচোখো যে, তার চরিত্রে কোনও দাগ রাখেননি।

হীরু হতে পারত বদ্‌রাগী কিন্তু আশুতোষ। বুদ্ধিমান কিন্তু নিরক্ষর। ডাকাত হয়েও দোষেগুণে পুরোদমে মানুষ।

আশা করা যায়, শ্রুতিনাট্য আর দৃশ্যকাব্য হয়েও 'হীরু ডাকাত' মঞ্চে আর পর্দায় ছোটদের মন কেড়ে নেবে।

সৌজন্য: আজকাল। প্রকাশ: ১৫ মে, ১৯৮৯

লেখক পরিচিতি

(১২ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯-৮ জুলাই, ২০০৩) অকাদেমি ও জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে ভূষিত বাংলা সাহিত্যের অমর পদাতিক কবি। 'কর্মক্ষেত্র' পত্রিকায় নিয়মিত লিখেছেন 'কাজের বাংলা'।

. . . . . .

***সম্পাদকীয় সংযোজন**

কবেকার, কোথাকার হীরু ডাকাত?

১৫ মে-র আজকালে অগ্রগণ্য শ্রদ্ধাস্পদ কবি সুভাষ মুখোপধ্যায়ের 'এমন যে হীরু ডাকাত, কেমন লোক সে' লেখাটি পড়ে আমি কৃতার্থ ও কৃতজ্ঞ। এতদিন ছিলাম তাঁর গুণমুগ্ধ, এবার সেই সঙ্গে স্নেহধন্যও হলাম। অখ্যাত নবীনের প্রতি প্রখ্যাত প্রবীণের এই সস্নেহ, উদার মনোযোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর তীক্ষ্ণ নজর ও অনবদ্য রচনাগুণে আমি নানাভাবে উৎসাহিত ও উপকৃত বোধ করছি। ঋণী তো বটেই।

আলোচনার এক জায়গায় দেখলাম, হীরুকে ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে বলে তাঁর ধারণা। হীরু ডাকাতের সংশয়াচ্ছন্ন লেখক হিসেবে এটাও আমার পক্ষে খুবই আনন্দের।

আজকালে হীরু ডাকাতের প্রথম অভিযান লেখার পর আমি মনে মনে কাজটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হই। হীরুর আর কোনও কথা বা কল্পনা আমার স্বপ্নেও ছিল না। কিন্তু সম্পাদকীয় অনুরোধে ক্রমশ হীরু ডাকাতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অভিযান লিখতে হয়। হীরুর প্রথম অভিযান ঘটে ১৯০০ সালে, সেই মতো দ্বিতীয় অভিযান ১৯০৬ ও শেষ অভিযান ১৯০৯ সালে ঘটতে দিই। ইতিহাসের পাতায় ১৯০০, ১৯০৬ বা ১৯০৯ সালে হীরু নামে কোনও ডাকাত বা আমার রচনায় তার যেসব ডাকাতির কথা আছে তেমন কোনও ডাকাতির ঘটনা পাওয়া যায় কিনা আমার জানা নেই। আসলে নিছক জানা জিনিস লিখতে আমার মন বসে না, আমার ঈপ্সা কল্পনার ডানা। তবে সব কল্পনার মজ্জায় থাকে বাস্তব, থাকে বাসনা, থাকে সমসাময়িকতা— তা সে প্রস্ফুটিত বা স্ফুটনোন্মুখ যাই হোক না কেন। হীরুর ডাকাতির ধরনেও কখনও কখনও হয়তো ফুটে উঠেছে ছেলেবেলায় মায়ের মুখে শোনা ভালো ভালো ডাকাতদের কথা। কিন্তু হীরু তো আর সত্যি সত্যি ইতিহাসের নয়, আমার রচনায় যাতে তাকে ইতিহাসের সত্যি মানুষ বলে মনে হয় তারই চেষ্টা করেছি। তাই ১৯০০, ১৯০৬, ১৯০৯-এর ফাঁদ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই ফাঁদে পড়ে কালচিহ্নকেই ভেবেছেন ইতিহাসের

কালপঞ্জি। আমার লেখায় ভূগোলের ভান দেখেও তিনি ভুলেছেন। তিনি লিখেছেন— শুধু কাল নয়। আছে দেশেরও হদিস: 'বাড়ি চাঁদের হাট।' 'এই তো এটা কাকদ্বীপ।' 'আমিই ছিলাম রসুলপুরের প্রজা।' 'হনহনিয়ে হেঁটে যাচ্ছে বাঁকুড়া আর বর্ধমানের মোড়ে।' 'ঘোড়ামারির ছিদাম দাস।' 'ব্যাটা টাকীর মহাজনের ফেউ।' 'আমরা যাচ্ছি সোনাইদিঘি।' 'এটাই তোমার ছাগলচরা দ।' 'বাংলা বিহার সীমান্তে।' কল্পনার হীরু ডাকাতকে সত্যি করে তুলতে দেশ-কাল বা ইতিহাস-ভূগোলের টানাপড়েন বুননটি দরকার হয়েছিল, রচনায় দরকারের দাগগুলি যাতে চোখে না পড়ে— লেখকমাত্রেরই তা সভয় অর্জনের ব্যাপার। সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং অত বড় কবি, তাঁর কাছে আমার মতো সামান্য লেখকের ছলনা ধরা পড়ে যায়নি, হীরু ডাকাতকে তিনি ইতিহাসের সত্যি মানুষ বলে মনে করেছেন—এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কী হতে পারে! তিনি লিখেছেন— 'ভূমিকায় বলা না হলেও, পড়ে মনে হয় ইতিহাসের পাতা থেকে হীরুকে তুলে আনা হয়েছে।'

বইয়ের ভূমিকা লিখতে আমার বেশ লজ্জা। যদি নির্লজ্জ হতেও পারতুম, তাহলে কি লিখতে পারতুম— এই গ্রন্থের সব চরিত্র ও ঘটনাই কাল্পনিক? ছোটদের বইয়ে তা আবার লেখা যায় নাকি! ইতিহাসের পাতা কি পুলিশের খাতার বাসিন্দা হওয়া তো দূরের কথা, হীরু এমনকী আদৌ কোনও ডাকাত তো? লেখায় মগ্ন দিনগুলিতে, হঠাৎই কখনও এমনও মনে হয়েছে, ডাকাতিটা আসলে তার ছদ্মবেশ তো নয়? ছদ্মবেশ ধরতে সে ওস্তাদ, পুরুত কি পুলিশের চর কি আজন্ম গয়লা— যখন যে-ছদ্মবেশ সে নিয়েছে, প্রতিপক্ষের সাধ্য কী তা ভেদ করে। হয়তো তার সেরা ছদ্মবেশ ডাকাতের! এইভাবেই আমার মনের মধ্যে হীরু ও তার বাঁশি ও তার জবাবনের জন্ম। ইতিহাসের কথাটা কোনও কোনও সমালোচকও তুলেছেন দেখে সসঙ্কোচে এও উল্লেখ করতে হয়, হীরুর দলের নীলু বিলু পান্না পাঁচু ইসমাইল কেউই দলিলবন্দী কোনও নাম বা চরিত্র নয়, আমার রচনা মাত্র। কল্পনাকে শ্বাস-প্রশ্বাসময়, ধরা-ছোঁয়ার বাস্তব গড়ে তোলাই কি নয় রচনা? আর একথাও আজ আর কে না জানে, ইতিহাসের পাতা থেকে তুলে আনা না হলেও সাহিত্যের চরিত্রমাত্রকেই শেষপর্যন্ত, গূঢ় অর্থে, ঐতিহাসিক হয়ে উঠতেই হয়!

হীরু ডাকাত নিয়ে প্রায়-দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে শ্রদ্ধাস্পদ কবি, ও সেটি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় প্রকাশ করে আপনারা বইটিকে পুরস্কৃত করেছেন, বইটির লেখক তার যোগ্য কিনা সে সংশয় থেকেই যায়। —অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

সৌজন্য: আজকাল। প্রকাশ: ৮ জুন, ১৯৮৯